প্রতিবেশীর হক

পার্থিব জীবনে আত্মীয়তা, দ্বীনদারী বা মানবতার কারনে আমাদের আবাস স্থল, কর্মক্ষেত্র বা অন্যান্য কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে এক সম্পর্ক গড়ে উঠে । আর এ কারনে একে অপরের উপর অর্পিত হয় এক বিরাট দায়িত্ব । কাছাকাছি থাকার কারনে, পাশাপাশি কাজ করার কারনে আর এক সাথে উঠাবসার কারনে একের উপর অন্যের পারস্পারিক যে দায়ীত্ব অর্পিত হয় তাকেই বলে 'হক'। পাশাপাশী বসবাসের কারনে হোক, একসাথে চাকরী করার কারনে হোক বা পার্থিব জীবনের যে কোন প্রয়োজনে কাছাকাছি থাকার কারনে হোক এক জনের উপর অন্য জনের যে হক অর্পিত হয় তার আবেদন হলো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে থাকবে ভালবাসা, থাকবে সহমর্মিতা, একজন অন্যজনের সুবিধার কারন হবে, একজনের সাহায্যে অন্যজন হবে নিবেদিত প্রান, একজন অসুস্থ হলে অন্যজন এগিয়ে আসবে তার সেবায়, কারো কষ্টের কারন হবার পরিবর্তে পরস্পর পরস্পরের কষ্ট দূরীকরণে হবে সচেষ্ট আর ব্যাতিব্যস্ত থাকবে একে অপরের আরাম আয়েশের ব্যবস্থাপনায় । এই ধরনের সম্পর্কে সম্পর্কিত দুইজনকে বলা হয় একে অপরের 'প্রতিবেশী' ।

প্রতিবেশীই থাকে সবচেয়ে কাছে, প্রয়োজনে তাকেই পাওয়া যায় সবার আগে । আত্মীয় যদি দুরে থাকে তবে তাকে কাছে পাবার আগে প্রতিবেশীর সাহায্যই হয়ে উঠে সময়োপযোগী ও কার্যোপযোগী। তেমনিভাবে কাছে থাকার কারনে ও একসাথে চলাফেরার কারনে একে অপরের কষ্টের কারন হবার সূযোগও সবচেয়ে বেশী, আর বাস্তবে তা হয়েও থাকে । এই জন্য ইসলামে প্রতিবেশীর সম্পর্কের বিরাট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যেন এক জনের অন্তরে অন্যজনের বড়ত্ব ও গুরুত্ব থাকে, নিজেদের পারস্পারিক প্রয়োজনে যেন তারা মিলেমিশে চলতে শেখে । একে অন্যের ইজ্জত আবরুর ব্যাপারে ও মালদৌলতের ব্যাপারে যেন পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারে, কোন মুমিন মুসলমানের জন্য এমন গুনের অধিকারী হওয়া অত্যন্ত জরুরী । প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারনা এমন হওয়া উচিত যে, সে একজন মুসলমান, হুজুরের (সাঃ) অনুসারী, ইসলামের পাবন্দ আমার দ্বারা তার কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়, সে আমার দুঃখ কষ্টের শরীক । আমি ঘর ছেড়ে চলে গেলেও তার দ্বারা আমার পরিবারের কোন ক্ষতি সম্ভব নয় এই জন্য যে, সে একজন মুসলমান, এই জন্য যে সে ইসলামের একজন পাবন্দ, এই জন্য যে তার অন্তরে তৌহিদের নূর বর্তমান আর এই জন্য যে তার অন্তরে হুজুরে পাক (সাঃ) এর তালিমাতের গুরুত্ব ও বড়ত্ব বর্তমান । আর যার অন্তরে তৌহিদের নূর আর হুজুর পাক (সাঃ) এর আহ্‌মিয়াত থাকবে তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়ও থাকবে । যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকবে তার উপরে নিজের ঘরের ব্যাপারে, ঘরের জিনিস পত্রের ব্যাপারে, নিজের পরিবারের ব্যাপারে ও নিজের ইজ্জত আবরুর ব্যাপারে পুরোপূরি ভরসা করা যেতে পারে । আল্লাহ্‌ পাক তার বান্দাকে ও রসূল (সাঃ) তার উম্মতকে যেমন পিতা মাতার ও আত্মীয় স্বজনের হকের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন তেমনিভাবে কুরানে কারীমে ও হাদিসে পাকে খুব গুরুত্বের সাথে প্রতিবেশীর হকও বর্ণনা করা হয়েছে ।

প্রতিবেশী তিন ধরনের হতে পারে একঃ মুসলমান ভাই যিনি আত্মীয় আবার প্রতিবেশীও । এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের সম্পর্ক, প্রথমত ঈমানদার ভাই হওয়ার কারনে তাকে কোন কষ্ট দেওয়া যাবে না, দ্বিতীয়ত আত্মীয়তার সম্পর্কের কারনে তাকে কোন কষ্ট দেওয়া যাবে না, তার আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতে হবে, তৃতীয়ত প্রতিবেশী হওয়ার কারনে তার দুঃখ কষ্টের খবরাখবর রাখতে হবে , তার দুঃখ কষ্টে শরীক হতে হবে, নম্রতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে । তিন ধরনের সম্পর্কে সম্পর্কীত এই ধরনের প্রতিবেশীর হক সব চাইতে বেশী । দুইঃ দূর বা কাছের আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু তিনি মুসলমান এবং প্রতিবেশী, এই ধরনের প্রতিবেশীর জন্য দুই ধরনের হক প্রতিষ্ঠিত হয় এক. মুসলমান ভাই হওয়ার কারনে দুই. প্রতিবেশী হওয়ার কারনে । তিনঃ আত্মীয়তার কোন সম্পর্কও নাই আবার মুসলমান ভাইও নয় অথচ প্রতিবেশী যেমন-

ইহুদী, নাসারা, মাজুসি অথবা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী বা কোন ধর্মহীন প্রতিবেশী । এই ধরনের ঈমান নাই বা আমার ধর্মের বাইরের অথবা অন্য যে কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী প্রতিবেশীরও হক আছে । ইসলামই বলে দিচ্ছে যে তোমার প্রতিবেশী ইহুদী হোক , নাসারা হোক, মুর্তি পূজক হোক, অন্য যেকোন ধর্মাবলম্বী হোক বা কোন ধর্মই তার না থাকুক প্রতিবেশী হওয়ার কারনে আচার ব্যবহারের নম্রতায় ও তার দুঃখ কষ্টের অংশীদারিত্বে আর তার আরাম আয়েশের ব্যবস্থাপনায় তোমার উপর পূর্ণ জিম্মাদারী বর্তাবে । তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, তার দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতে হবে, অসুস্থতায় সেবাযত্ন করতে হবে , ক্ষমতা থাকলে যে কোন অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে, নিজের তরফ থেকে কোন রকম কষ্ট দেওয়া যাবে না আর তার তরফ থেকে কোন কষ্ট পেলে তা সহ্য করে নিতে হবে তার কোন জবাব দেওয়া বা বদলা নেওয়া যাবে না ।

হুজুর পাক (সাঃ) হাদিস বর্ণনা করেন-''কোন মুসলমানের জিহ্বা বা হাত যেন অন্য কোন মুসলমানের কষ্টের কারন না হয়''। জিহ্বার দ্বারা কষ্ট অর্থাৎ কথার দ্বারা কষ্টের কথা বলা হয়েছে, আর কথার দ্বারাই মানুষের বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে, তীর তলোয়ারের জখমতো জলদী সেরে যায় কিন্তু কথার দ্বারা যে জখমের সৃষ্টি হয় তা সহজে সারে না । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমেই মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে আর সে কারনেই হুজুর পাক (সাঃ) প্রথমেই জিহ্বার ক্ষতিকারীতা সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দিয়েছেন । অন্য এক হাদিসে হুজুর পাক (সাঃ) বলেন- ''মুসলমানতো সে'ই যার জবান থেকে সমস্ত মানবকুল নিরাপদ থাকে'' । অনেকেই ইসলামের ছত্র ছায়ায় হয়তো নাই কিন্তু তারা আমাদের মতই মানবকুলের মধ্যে গন্য তাদের হকও কি আমাদের আদায় করতে হবে? আমরা মনে করে থাকি ইহুদীরা নাপাক, নাসারারা নাপাক বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নাপাক , আমাদের এ ধারনা ঠিক নয় । কোন মানুষ নাপাক হতে পারে না হুজুর (সাঃ) বলেন সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান অর্থাৎ সবাই একই বাপ মায়ের বংশধর, এখন সে- মুসলমান, ইহুদী, নাসারা, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আরবী, আজমী, কালো, ধলো যাই হোক না কেন সে এক বাবা মায়ের সন্তান সবার জড় একই শুধু শাখা প্রশাখা আলাদা আলাদা । তাইতো কুরানে কারীমে বলা হয়েছে-

يَاَ يُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰ كُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى (সূরা হুজুরাত-১৩)

হে মানব,আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি ।

এ কারনে যারা আমাদের মাযহাব বা ধর্মে সামিল নয় তারাও মানুষ হিসেবে আমাদের ভাই, আমাদের উপর তাদেরও হক আছে । হুজুর (সাঃ) বলেন সমগ্র মানুষই বণী আদমের সন্তান, আর আদমকে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে । তাই আদম যখন মাটির তৈরী আর সব মানুষই তার সন্তান তখন কারো কারো মধ্যে নাপাকী কিভাবে এসে যাবে, ইহুদীর হাত কিভাবে নাপাক হবে, নাসারার শরীর কিভাবে নাপাক হতে পারে , বিধর্মীর শরীর নাপাক কেন হবে, তাদের হাতে হাত কেন মিলানো যাবে না, তাদের শরীরে শরীর বা কাপড় ঠেকলে তা নাপাক কেন হবে, আমাদের মনের বদ্ধমূল এমন ধারনা মনগড়া ও সম্পূর্ণ ভূল । ইসলামে এমন ধারনার কোন স্থান নাই বরং হুজুর (সাঃ) এর তালিমতো হলো- সব মানুষের ঝুটাই পাক , কোন ইহুদী, নাসারা বা যে কোন বিধর্মীর পান করা অবশিষ্ট পানি পান করা যেতে পারে এতে ইসলামে কোন বিধি নিষেধ নাই । তবে কোন গ্লাসে যদি মদ বা অন্য কোন নাপাক বা হারাম জিনিস প্রথমে পান করা হয়ে থাকে তবে পরক্ষনেই আবার ঐ গ্লাসের পানি পান করা যাবে না । অন্যথায় পাক পবিত্র গ্লাসে যদি ইহুদী, নাসারা বা অন্য কোন বিধর্মী পানি পান করে আর অবশিষ্ট পানিতে যদি তার লালা বা থুথু লেগেও থাকে তবে তা পাক ও পবিত্র এ পানি পান করাতে ইসলামে কোন দোষ নাই । কারো শরীর নাপাক নয়, কোন কাফের, ইহুদী, নাসারা বা যেকোন ধর্মাবলম্বীর মসজিদে আসাতে দোষ নাই, এতে মসজিদ নাপাক হয়না । মসজিদে হারাম একটি মারকাজী মসজিদ এর বেলায় এ নিয়ম

আলাদা, এ ছাড়া অন্য সব মসজিদে অমুসলমানের আগমনে কোন দোষ নাই । একবার সাহাবা আজমাইন (রাঃ) ইমামার সর্দার সূমামা ইবনে উসালকে বন্দী করে হুজুর (সাঃ) এর কাছে নিয়ে আসেন, তিনি তাকে মুসলমানদের আমল, ইবাদাত ইত্যাদি দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে দেন । পরে হুজুর এসে তাকে জিজ্ঞেস করেন কেমন আছ সূমামা? উত্তরে সূমামা বলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) অনুগ্রহ করে আমাকে যদি ছেড়ে দেন তবে কৃতজ্ঞ হিসেবেই পাবেন, আর যদি কতলের রায় হয় তবে সেটা ইনসাফ হবে না, কেন না আমি একজন সিপাহী আর এ কারনেই আমাকে ধরে আনা হয়েছে, আর যদি মাল চান তবে আমার মাল থেকে যে পরিমান আপনি চাইবেন আমি আপনাকে তাই দিতে প্রস্তুত আছি । হুজুর (সাঃ) সেদিন চলে গেলেন, পরের দিন আবার তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন- কেমন আছ সূমামা? তিনি উত্তরে আগের দিনের মত একই কথা বললেন । ইতিমধ্যে তিনি মুসলমানদের ইসলামী আমলকে দেখেছেন, সাহাবাদের নামাযকে দেখেছেন, তাদের ইবাদত আর কান্নাকাটিকে দেখেছেন আর এর মাধ্যমে তার অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, মনে মনে ইসলামকে কবুল করার সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে কিন্তু তা বন্দী অবস্থায় নয় । হুজুর (সাঃ) সূমামাকে ছেড়ে দেবার অনুমতি দিলেন । ছাড়া পেয়েই তিনি সামনে অবস্থিত তালহা (রাঃ) এর বাগানে চলে গেলেন, সেখানে কূয়ায় গোসল করে হুজুরের কাছে ফেরৎ এসে ইসলামে দাখিল হয়ে গেলেন । এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটাই যে, হুজুর (সাঃ) সূমামা ইবনে উসালকে ঈমান আনার পূর্বেই মসজিদে দাখিল হবার অনুমতি দিয়েছিলেন অর্থাৎ এ থেকে বুঝা গেল যে কাফের বা অমুসলমানের মসজিদে যেতে বাধা নাই আর এতে মসজিদ অপবিত্র হয় না । তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা, তার বিপদে আপদে সাহায্য করা, অসুস্থতায় সেবাযত্ন করা , তাদের সবরকমের ভাল কামনা করা এগুলো মানুষ হিসেবে মানুষের জন্য ফরজ অর্থাৎ মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয়। হাদিসের দ্বিতীয় অংশে হুজুর (সাঃ) বলেন কোন মুসলমানের হাতের দ্বারা যেন অন্য কোন মুসলমান বা অমুসলমানের ক্ষতি না হয় । এখানে হাতের কথা বলে কারো শক্তি সামর্থ, শারীরিক বল, বংশীয় দাপট, দলগত বল ও নিজের অবস্থানের বা চেয়ারের ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে । উপরোক্ত ক্ষমতাবলীর অধিকারী হয়ে কেউ যেন কারো ক্ষতি না করে । এই ছিল সর্বতোভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য কথা ।

হুজুর পাক (সাঃ) মুসলমানের জন্য প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার ও ভাল আচার আচরণের উপর আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন । সাধারনের চাইতে প্রতিবেশীর হক অনেক বেশী । হুজুর (সাঃ) বলেন তোমার প্রতিবেশী যেই হোক না কেন, সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান হোক, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক, ধনী হোক আর গরীব হোক তার সাথে নম্রতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে । হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) সফরে রওনা হচ্ছিলেন এমন সময় উনার গোলামকে হুকুম দেন যে, তুমি যখন খাসি জবাই করবে এর গোস্ত তৈরী হয়ে যাবার পর আমার প্রতিবেশী যে ইহুদী আছে তাকে সর্ব প্রথমে গোস্ত দিয়ে আসবে । তিনি কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে গোলামকে একই কথা বলেন, এভাবে তিনবার ফিরে ফিরে তিনি তার গোলামকে একই কথা বললে গোলাম প্রশ্ন করলো একবার বললেই তো হতো আপনি বারবার একই কথা বলছেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন আমি হুজুর (সাঃ) কে প্রতিবেশীদের হকের ব্যাপারে এত জোর দিয়ে বলতে শুনেছি যে আমাদের তখন ধারনা হতো যে প্রতিবেশীদেরকে ওরশের অংশীদার করে দেওয়া হতে পারে । নিকট আত্মীয়স্বজনরাই ওয়ারীশ হয়ে থাকে, হুজুর (সাঃ) প্রতিবেশীর হক এত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করতেন যে মনে হতো প্রতিবেশীকে আত্মীয়তার দরজা দিয়ে দেওয়া হবে । এক হাদিসে এমন বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীর সাথে দূর্ব্যবহার আর বাকবিতন্ডা না করে । আরেক হাদিসে এসেছে প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরনকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না । বুখারী আর মুসলিম শরীফে বর্ণিত আরেক হাদিসঃ হুজুর (সাঃ) একবার সাহাবা আজমাইনদের আসরে বলেন, খোদার কসম সে মুমিন নয়, খোদার কসম সে মুমিন নয়, খোদার কসম সে মুমিন নয়, হুজুরের (সাঃ) বার বার কসম খাওয়ায় সাহাবা (রাঃ) ঘাবড়ীয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হুজুর আপনি কার

কথা বলছেন? তিনি বললেন যার খারাপ আচার আচরণ আর দূর্ব্যবহার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে মুমিন নয় । আজকাল তো শহর বন্দরে এমন প্রচলন হয়ে গেছে যে পাশের বাসার বা পাশের ফ্ল্যাটের কেউ কোন খবরই রাখে না । আরেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হুজুর (সাঃ) বলেন কেউ যদি দুঃখ কষ্টে থাকে বা না খেয়ে থাকে আর তার প্রতিবেশী তার কোন খবরাখবর না নিয়ে পেট ভরে খেয়ে আরামে শুয়ে পড়ে তবে সে আমার উপর ঈমানই রাখে না । একবার একজন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর কাছে এসে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে যে সে আমাকে খুবই কষ্ট দেয় । আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ তাকে বলেন যে ভাই সবুর কর, ধৈর্য ধর । সে পরবর্তিতে আবারো একই অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি বলেন যে দেখ, সে হুজুরের (সাঃ) নাফরমানী করছে, তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে তাই বলে তোমাকে তো আমি এই অনুমতি দিতে পারিনা যে তুমি তার জবাব দেবে আর তুমিও তাকে কষ্ট দিতে শুরু করবে, ও তোমাকে ভালমন্দ বলছে বলে তুমিও তাকে ভালমন্দ বলবে, বরং তোমার তো ধৈর্য্য ধারন করতে হবে, তোমার তো আল্লাহ্ ও তার রসূলের ফরমাবরদার হয়ে চলতে হবে ।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় অনূরুপ আরেক ঘটনা হুজুরের (সাঃ) জীবনেও ঘটেছেঃ একজন হুজুরের (সাঃ) কাছে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ করে যে, সে আমাকে নানা ভাবে কষ্ট দেয়, হুজুর (সাঃ) বলেন যে ভাই ধৈর্য্য ধারন কর, এর পর একই অভিযোগ নিয়ে ে স তিনবার হুজুরের (সাঃ) কাছে আসে আর হুজুর (সাঃ) তাকে একই উত্তর দিয়ে বিদায় করেন । চতুর্থবার ঐ ব্যক্তি সেই অভিযোগ নিয়েই আবার হুজুরের (সাঃ) কাছে আসলে তিনি বলেন যে দেখ তুমি কি বারবার একই অভিযোগ করছো এই কারনে যে আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে দিব যে, সে তোমার সাথে যেমন ব্যবহার করছে তুমিও তার সাথে তেমন ব্যবহার করবে? সে তোমাকে কষ্ট দিলে তুমিও তাকে কষ্ট দেবে? যদি এখানে বসবাস করা তোমার জন্য নিতান্তই কঠিন হয়ে পড়ে তো তুমি সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য এলাকায় চলে যাও । কিন্তু আমি তো তোমাকে এই অনুমতি দিতে পারবো না যে, সে তোমাকে ভাল মন্দ বললে তুমিও তাকে ভাল মন্দ বলবে, সে তোমাকে গালি দিলে তুমিও তাকে গালি দেবে, সে তোমাকে কষ্ট দিলে তুমিও তাকে কষ্ট দেবে । তিনিও সাহাবী ছিলেন যেই কথা সেই কাজ, এই ঘর তিনি ছেড়ে দেবেন, সমস্ত জিনিসপত্র তিনি বাহিরে বাহির করলেন । এখন রাস্তা দিয়ে এলাকা বাসী যে'ই যায় সে'ই জিজ্ঞেস করে কেন ভাই তুমি কেন এই এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছো, তুমিতো বড় ভাল লোক ছিলে তোমার কারণে এই এলাকাবাসীর অনেক উপকার হতো, তুমি কেন এই এলাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলে? বাধ্য হয়ে উনাকে ঘটনা খুলে বলতেই হলো যে দেখ উমুক আমার প্রতিবেশী সে সব সময় আমাকে জ্বালাতন করে, সার্বিকভাবে আমাকে কষ্ট দেয়, এ নিয়ে আমি বহুবার হুজুরের (সাঃ) দরবারে গিয়েছি কিন্তু তিনি আমাকে বদলা নেবার অনুমতি দেন নি, বরং আমাকেই এ এলাকা ছেড়ে দিতে বলেছেন তাই আমি হুজুরের (সাঃ) কথামত অন্যথায় চলে যাচ্ছি । এলাকায় ঘটনা জানাজানি হয়ে যেতেই প্রতিবেশী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে নিজ হাতে সব জিনিসপত্র তার ঘরে তুলে দেয় । হুজুরের (সাঃ) কথার আসর পড়ে, সে তাকে তার নিজ ঘরে নিয়ে গিয়ে তার কাছে মাফ চায় আর বলে যে আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছি মাফ করে দাও, ভবিষ্যতে আর কখনো আমি তোমার সাথে আর পূর্বের মত ব্যবহার করবো না, এখন থেকে আমিও তোমার হক আদায় করে চলবো ।

এখান থেকে বুঝা গেল যে প্রতিবেশীর হক শুধু এটাই নয় যে, তার সাথে শুধু ভাল ব্যবহার করতে হবে, তার আরাম আয়েশের দিকে খেয়াল করতে হবে বরং তার হক তো এটাও যে তার তরফ থেকে কোন কষ্টদায়ক ব্যবহার পেলে তার জবাব না দিয়ে তা সহ্যও করতে হবে, কোন বদলা না নিয়ে চুপ করে থাকতে হবে । সে যদিও আল্লাহ্র নাফরমানী করে তুমি তা করবে না, সে রসূলের (সাঃ) নাফরমানী করলেও তুমি করবে না, তার দেওয়া কষ্ট নীরবে সহ্য করে যাবে তাহলে কোন না কোন সময় সে তার ভূল বুঝতে পারবে, সর্মীন্দা হয়ে তোমার কাছে আসবে । বরঞ্চ হুজুর পাক (সাঃ) এর তালিমতো হলো প্রতিবেশী কষ্ট দিলেও নিজে সাবধান থাকতে হবে আমি যেন তাদের কষ্টের কোন কারণ হবার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়, উপরন্তু হুজুর প্রতিবেশীকে উপঢৌকন

পাঠাবার উপদেশ দিয়েছেন, এতে করে অন্তরের কুটিলতা দূর হয়, মানষিক দূরত্ব কমে আসে ও পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা বাড়ে । হুজুর (সাঃ) এ পর্যন্ত হুকুম দিয়েছেন যে যদি তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের জন্য কোন ফলমূল, চকলেট বা যে কোন খাবার কিনে আন তবে এই পরিমান কিনবে যেন প্রতিবেশীর বাচ্চাদের হাতেও কিছু কিছু দিতে পার, আর যদি তা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে চুপ করে নিয়ে এসে তোমার বাচ্চাদের হাতে দেবে যেন তারা টের না পায়, আর তোমার বাচ্চারাও যেন সেগুলো খেতে খেতে বা হাতে নিয়ে তাদের সামনে না যায় । অন্যথায় তোমার কারনে গরীব প্রতিবেশী ও তাদের বাচ্চারা তাদের অসামর্থের জন্য মনকষ্ট পেতে পারে ।

ইমাম গাজ্জালী, ইবনুল মুকাফ্ফা নামে এক বুজুর্গের ঘটনা লিখেছেন তিনি কখনো কখনো তার প্রতিবেশীর ঘরের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতেন । একদিন তিনি দেখতে পেলেন যে তার প্রতিবেশী ধার কর্জ পরিশোধ করতে না পেরে তার বাড়ী বিক্রি করতে যাচ্ছে । তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার বাড়ীর দাম কত ? সে দাম বললে তিনি বললেন আমি এই বাড়ী কিনে নিলাম । তিনি দাম পরিশোধ করে দিলে প্রতিবেশী বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলে তিনি বললেন দেখ ভাই তুমি আমার প্রতিবেশী এই টাকাও তোমার আর এই বাড়ীও তোমার, তুমি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঘরহারা পথের পথিক হয়ে গেলে আমি প্রতিবেশী হিসেবে তোমার কি কাজে আসলাম, তুমি এ বাড়ীতেই আমার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে থাকো ।

সফরের সময়েও আমাদের আশপাশের যাত্রীরা আমাদের প্রতিবেশী, সেখানেও খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের মাধ্যমে তারা কোন কষ্ট না পায় । বসার সময় অন্যের বসার সুবিধা রেখে বসতে হবে, ধুম পান নিষেধ থাকলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে, আর ধুম পানের অনুমতি থাকলেও অন্যের অসুবিধা করে তা করা যাবে না । প্রতিবেশীর হক আদায়ের নিমিত্যে বর্তমান জামানায় বাস, ট্রেন, ষ্টিমার, ফেরী, বিমান ইত্যাদিতে ভ্রমন কালে অত্যন্ত শতর্কতার সাথে ও নিয়ম অনুযায়ী টয়লেট ব্যবহার ও তার রক্ষনাবেক্ষনের দিকে খেয়াল রাখা একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরী । অনুরুপ ভাবে মুখের দূর্গন্ধ, জুতা, মোজা ও পায়ের দূর্গন্ধও অন্যের কষ্টের কারন হয়ে থাকে, আর একটু খেয়াল করলেই এগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুব কঠিন কিছু নয় । প্রতিনিয়ত বাসায়, অফিসে, ব্যবসা বানিজ্যে, দোকানে, কারখানায়, মসজিদে, ভ্রমনে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুলো একজনের উপর অন্যজনের হক ।

এখন কথা হলো এই হক আদায় করবে কে? কুরানে কারীমে এই হকের কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই তৌহীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষে গর্বের অপকারিতার বর্ণনা করা হয়েছে । যদি এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে মজবুত বিশ্বাস না থাকে বা থাকলেও অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকে অথবা ভয় থাকা স্বত্বেও যদি কেউ আপন পছন্দের বশবর্তী হয়, অন্তরে গর্ব থাকে তবে তার দ্বারা এই হক আদায় হবে না । যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তা হলো আল্লাহ্‌র ভয় ও পরহেযগারী । যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় আছে, তৌহীদের বিশ্বাস আছে, যে অনুগত, যে আপন পছন্দের বশবর্তী নয়, যার বড়াই আর গর্ব নাই সে সহজেই বাবা মায়ের হক, ফকির মিশকীনের হক, মুসাফিরের হক ও প্রতিবেশীর হক আদায় করতে পারবে । আর যার আকীদায় গড়বড়, যে আপন পছন্দের বশবর্তী, যার ভিতরে আমি বড় ভাব আছে সে প্রতিবেশী নিকট আত্মীয় হলেও তার সাথে তার মানিয়ে চলা খুব কঠিন হয়ে যাবে, খুব সহজেই তার সাথে লেগে পড়বে এমনকি হাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে । হাসাদ কাকে বলে? হাসাদ হলো কোন কিছু আমি পাই আর না পাই অন্যের কাছে যেন সেটা না থাকে, অন্যকেউ খুব সুন্দর একটা বাড়ীর মালিক সে বাড়ী আমি পাই আর না পাই মনে মনে এমন চাওয়া যে সেটা যেন তার না থাকে, আমার চাকরী থাকুক আর না থাকুক তার টা যেন না থাকে । কিন্তু কেউ যদি মনে মনে এমনটা চায় যে তার মত ভাল একটা চাকরী, তার মত ভাল একটা বাড়ী, একটা গাড়ী, তার জ্ঞানের মত সুন্দর জ্ঞান আমারও হোক এমন আকাংখায় দোষের কিছু

নাই । এটা যেমন নাকি সে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ্‌ তোমার এই বান্দাকে তুমি যেমন সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে রেখেছ এমন এমন জিনিসগুলো দয়া করে আমাকেও দাও । একে বলে রাশ্‌ক্‌ বা গীব্‌তা যা জায়েয ।

হুজুর (সাঃ) বলেন দুই ধরনের লোকের সাথে রাশ্‌ক্‌ করা বা প্রতিযোগীতা করা উত্তমঃ এক. ঐ ব্যক্তি যার কাছে দ্বীনের সহী জ্ঞান আছে আর সে, সে অনুযায়ী আমল করে, অন্যকেও আমল করার জন্য অনুপ্রানীত করে আর ঐ জ্ঞান দিয়েই সে সব কিছুর ফায়সালা করে । দুই. ঐ ব্যক্তি যে হালাল পথে উপার্জন করে আর দ্বীনের প্রয়োজনে দুই হাতে খরচ করে, তার খরচ করা দেখে মানুষে বলে যে, সে পাগল হয়ে গেছে সব কামাই নিঃশেষ করে দিচ্ছে, বাস্তবে কিন্তু সে'ই তার কামাই তার সাথে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে । একবার সুফিয়ানে সওরীর কাছে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সম্পর্কে আপনার ধারনা কি? তিনি উত্তরে বলেন আবু হানিফা খুব কৃপণ লোক । প্রশ্নকর্তা চিন্তায় পড়ে গেল যে যেই আবু হানিফা রমজান মাসে ঈদ আসার পূর্বেই কুফা নগরীর সমস্ত বিধবা ও সমস্ত এতিমের পরিধেয় কাপড়ের ব্যবস্থা করেন তিনিই যদি কৃপণ হন তবে দাতা কাকে বলা যাবে । ওলামাদের উপরও ইনি বেহিসাব খরচ করতেন, বিরাট কারবার ছিল উনার যদিও তিনি নিজে কারবারে ব্যস্ত থাকতেন না কিন্তু তা থেকে তার যে মুনাফা আসতো তাই তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতেন । ফেকাহ্‌ স্বাস্ত্রের অনুশীলন ও তার প্রয়োগের নিমিত্তে তিনি নিজে ৫০০ ওলামার খরচ বহন করতেন । প্রতিদিন ইশার নামাযের পর ইমাম আবু হানিফা শুধু কোরান আর হাদিসের হাফেজদের নিয়ে এক বিরাট মজলিশ বসাতেন । প্রশ্নকারী আবারো প্রশ্ন করলো যে এত কিছু করার পরও ইমাম সাহেব কিভাবে কৃপণ হতে পারেন ? সুফিয়ানে সওরী উত্তর দিলেন আমি তো উনাকে এই কারনে কৃপণ বলেছি যে উনি কখনো কারো গীবত করেন না, কারো দোষ বয়ান করেন না । যে গীবত করে তার নেকী থেকে যার গীবত করা হয় তাকে নেকী দিয়ে দেওয়া হয়, তাই ইমাম সাহেব যেহেতু কারো গীবত করেন না উনার কামাই করা নেকী সব উনার কাছেই জমা থেকে যায়, উনার নেকী থেকে কিছুই খরচ হয় না এই কারনেই আমি উনাকে কৃপণ বলেছি ।

অন্যের ভাল জিনিস বা গুনাবলী নিজের জন্য চাওয়া হলো রাশ্‌ক্‌ এতে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন । আর অন্যকে দেওয়া আল্লাহ্‌র নেয়ামত তার কাছ থেকে সরে যাক এমন চাওয়া আল্লাহ্‌র সাথে মোকাবেলার সমান যাকে হাসাদ বলা হয়, এটা বিরাট বড় ক্ষতির কারণ । এই জন্য হযরত জাকারিয়া (রঃ) বলেন যে আল্লাহ্‌ যেটা তার কোন এক বান্দাকে দিয়ে রেখেছেন কারো পক্ষে সেটার বিরোধীতা করা বা তার বিপরীত বলা মানুষের অন্তরের এক চরমতম খারাপ অবস্থা । এই জন্য হুজুর (সাঃ) বলেন যে ''তোমরা নিজেদেরকে হাসাদ থেকে বাঁচাও, হাসাদ নেকীকে ঐভাবে খেয়ে শেষ করে আগুন যেভাবে খড়িকে খেয়ে শেষ করে''। আগুনের যেমন খড়িকে খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও আগুন আগুনকেই জ্বালাতে থাকে, দোজখ যেমন আল্লাহ্‌র কাছে নালিশ করবে যে আমার আগুনই আগুনকে আরো তেজ করে দিচ্ছে, ঠিক তেমনি হাসাদকারী প্রথমে অন্যের ক্ষতি চাইতে থাকে (যদিও কারো লাভ ক্ষতি করা তার এখতিয়ারের বাইরে) আর যখন তার কোন ক্ষতি হয় না তখন সে নিজে নিজেই জ্বলতে থাকে । এটা মানুষের এক বিরাট বড় মানষিক অসুস্থতা, অন্যের সম্পর্কে কারো মনে এমন ধারনার উদ্রেক হলে এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য যার সম্পর্কে এমন ধারনা হয় তার সাথে বারে বারে স্বাক্ষাৎ করা, তার তারিফ করা, তাকে সালাম করা ও তার জন্য বেশী বেশী করে দোয়া করা একান্ত দরকার ।

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে বায়হাকীর হাদিসঃ হুজুর পাক (সাঃ) একবার সাহাবাদের নিয়ে বসে ছিলেন এমন সময় তিনি বললেন যে, তোমাদের সামনে দিয়ে এখন এক ব্যক্তি অতিক্রম করবে যে নাকি বেহেশতী । সাহাবারা খুব আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন । কিছুক্ষনের মধ্যেই সদ্য অজু করা এক ব্যক্তি তাদের সামনে দিয়ে মসজিদে চলে গেলেন আর হুজুর বললেন এই সেই ব্যক্তি যার কথা আমি একটু আগে বললাম । আব্দুল্লাহ্‌

ইবনে আমর ইবনে আস এর আগ্রহ বেড়ে গেল কি এমন আমল তার মধ্যে আছে যে হুজুর তাকে বেহেশতী বলে সাক্ষ্য দিলেন । তিনি দু'দিন ধরে ঐ ব্যক্তিকে খেয়াল করতে থাকলেন, তিনি নামাযের সময় আসেন আবার নামায পড়েই চলে যান তার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছুই লক্ষ্য করতে পারলেন না । অবশেষে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস তার সাথে কথা বললেন ও তার সাথে সাথে তিন দিন থাকার অনুমতি চাইলেন । অনুমতি পেয়ে তিনি রাত জেগে তাকে অবলকন করতে লাগলেন কখন তিনি ইবাদত শুরু করেন, কখন তাহাজ্জুদ আরম্ভ করেন এই অপেক্ষায় থাকতে লাগলেন । কিন্তু না তিনি সারা রাতই ঘুমিয়ে কাটালেন এবং একেবারে ফজরের আযান হলে তিনি অজু করে মসজিদে রওনা হলেন আর নামায পড়েই বাসায় ফিরলেন । এই তিন দিনেও উৎসুক সাহাবি তার মধ্যে নূতন কিছুই পেলেন না । অগত্যা বাধ্য হয়ে তিনি উনাকে বললেন যে দেখ সেদিন হুজুর (সাঃ) আমাদের অনেকের সামনে তোমার বেহেশতী হবার ব্যাপারে শাহাদাত দিয়েছেন, আর তখন থেকেই আমার জানবার খুব আগ্রহ কি এমন আমল তোমার আছে যে তিনি তোমার বেহেশতী হবার শাহাদাত দিলেন । ঐ ব্যক্তি, হুজুর (সাঃ) কর্তৃক সাহাবাদের সামনে তার সম্পর্কে দেওয়া সংবাদ শুনে আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে দিলেন, বললেন যে দেখ আমার মধ্যে তো আমিও তেমন কোন বিশেষ আমল খুঁজে পাই না, তবে আমি কখনো কারো গীবত করিনা, অন্য কারো সম্পর্কে আমার মনে কখনো কোন খারাপ ধারনা হয় না, আমার মন একেবারে আয়নার মত পরিষ্কার, হতে পারে এ কারনেই হুজুর (সাঃ) আমার বেহেশতী হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন । হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলে উঠলেন ঠিক ঠিক এটাই ঠিক আর কোন কথা নাই তুমি যা বলেছ এটাই ঠিক ।

প্রতিবেশীর সাথে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অনেক সময় বড় বড় ঘটনার সূচনা হয়ে যায় । সেজন্য শুরুতেই যে কোন ঘটনা মিটিয়ে ফেলা উচিত । আর হুজুর (সাঃ) এর তালিম অনুযায়ী চললে তো আমাদের কোন শত্রুই থাকার কথা নয় । আমাদেরকে সবাই ভালবাসবে, এটাই হুজুরের সুন্নত আর তালিমের আসর । আমরা যে যেখানে কাজ করি সে সেখানে যদি চেষ্টা করতে থাকি যে আমার দ্বারা যাতে কারো কোন অসুবিধা না হয় তবে দেখা যাবে যে সবাই আমাদেরকে ভাল জানবে ও ভালবাসবে । আমরা যদি মানুষের উপকার করি আমাদের দ্বারা যদি কারো কোন ক্ষতি না হয়, সবাই যদি আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারে তবে সবাই অন্তর দিয়েই আমাদেরকে ভালবাসবে । আল্লাহ্ ওয়ালাতো সে'ই যে কাফেরকেও ঘৃনা করে না কুফুরকে ঘৃনা করে, গুনাহ্গারকে ঘৃনা করে না গুনাহ্কে ঘৃনা করে, মদ্যপায়ীকে ঘৃনা করে না মদপানকে ঘৃনা করে । আর এইভাবে যখন নিয়ম অনুযায়ী সবার হক কে আদায় করা হবে তখন কাফের, গুনাহ্গার ও মদ্যপায়ীও নিজের ভূল বুঝতে পারবে আর সত্য দ্বীনকে কবুল করে নেবে ।

যখন আল্লাহ্র একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাস আসবে, অন্তরে খোদার ভয় থাকবে, নিজ পছন্দের বশবর্তী হয়ে না পড়বো, গর্ব না থাকবে, নিজেকে নিজে ছোট জ্ঞান করতে পারবো তখন আল্লাহ্র হক আদায়ের সাথে সাথে বান্দার হক আদায়ও আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে । আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে রুহানী পাক পবিত্রতা দান করুন আর হুজুরের (সাঃ) তালিমের উপর ভরপূর আমল করার যোগ্যতা দান করুন । আমিন ।

৪০৭-৭১ থর্নক্লিফ পার্ক ড্রাইভ
২৫ জিল হজ্ব, ১৪২২
১৪ ফাল্গুন, ১৪০৮
৯ মার্চ, ২০০২ ।